ইভানার রুমমেট বললো–মা বিকেলে পিঠে পাঠিয়েছেন। দেবো আপু। ইভান-ঋতি দু'জনই ঘার নেড়ে হ্যাঁ বললো। ঋতির গলা শুনে পাশের রুমের দীপিকা ভদ্রও এলো–ইভানা জগে আরও এককাপ পানি বাড়িয়ে দিলো। দীপিকা দ্রুত গিয়ে রুম থেকে বিস্কুট নিয়ে এসে বসলো। তিন বান্ধবী আর একজন জুনিয়র অনেকক্ষণ গল্প করলো। ওরা হোস্টেলের তিনতলায় থাকে। হোস্টেলটা চারতলা। ছাদে ওঠার ব্যবস্থা নেই। তবে চারতলাটা তিনতলার সমান না–তিনতলার দক্ষিণদিকে দু'-তিন রুম সমান ছাদের মতো আছে। এজায়গায় মেয়েদের সান্ধ্যকালীন আড্ডা হয়। মেডিকেল আর বুয়েটের মধ্যখানের রাস্তাটার কিছুটা দেখা যায় এখানে দাঁড়ালে। চা আর আড্ডা শেষে ঋতি সে-দিকটায় যাচ্ছিলো। পথেই বারান্দায় আফসানার সঙ্গে দেখা–আফসানা কেবল দরজা খুলে বেরিয়েছে। দু'জন কথা বলতে-বলতে দক্ষিণের ছাদের দিকে গেলো। দু'জনই অনেকক্ষণ কাটালো সেখানে। একটা গাড়ি জোরে-জোরে হর্ন বাজাচ্ছে–বুয়েটের কোয়ার্টারে ঢুকবে। গেটে দারোয়ান নেই–হয়তো চা-সিগ্রেট খেতে গেছে, নয় প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে পাশেই আছে কোথাও; এদের ডিউটি করার ব্যবস্থা থাকলে মল-মূত্র ত্যাগের কথা কেউ ভাবে না, তাই যেখানে-সেখানেই ওরা...। দারোয়ান দৌড়ে এসে গেট খুলে দিলো। গাড়ির পেছনে একটা রিকশাও তখন অপেক্ষমান–দারোয়ানের নানা প্রশ্নের সম্মুখীন রিকশাওয়ালা। অথচ গাড়িকে ছেড়ে দিয়েছে কোনও প্রশ্ন ছাড়াই।

– দেখলি ঋতি, একই গেটম্যান। গাড়িকে ছেড়ে দিলো বিনা বাক্য ব্যয়ে। আর এখন!

– এমনি-ই হয়রে। এসব গাড়ি-টাড়ি হচ্ছে স্ট্যাটাস সিম্বল–এসব সঙ্গে থাকলে অনেক জায়গায় বিনা বাধায় চলে যেতে পারবি।

একটার দিকে রুমে ফিরে আসে ঋতি। কতক্ষণ পায়চারি করে। একটা বই নিয়েও বসে। কিন্তু কিছুক্ষণের জন্য। ব্যাগ থেকে এ্যালবামটা বের করে। ভাই-বোনের কতগুলো টাচি ছবি আছে এ্যালবামটাতে। দেখতে থাকে সে–কোনটা খানিকক্ষণ। কোনটার দিকে অনিমিষনেত্রে বহুক্ষণ। ব্যাগ থেকে ডায়েরিটাও বের করে; ক'টা পাতা উল্টায়–কলমও হাতে নেয়, কিন্তু কিছু লেখে না, দু'-একটা আঁকজোক ছাড়া।

আরও একবার বেরোয়। হেঁটে-হেঁটে আবার দক্ষিণের ছাদে যায়। ছাদটায় এবার একা–রাত বারোটার পর একটু ঠান্ডা পড়েছে যেন। আকাশের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকে–একটা তারাই যেন লক্ষ্য, অপলক তাকিয়ে থাকা। নিজের মনেই বলতে থাকে–ঋভু, তোকে যে আমি দেখতে পাচ্ছি দাদাভাই। ওই, ওই তারাটি-ই-তো তুই দাদাভাই। আমাকে কী দেখছিস না! আমার দিকে তাকিয়ে দ্যাখ, একটিবার কথা বল ঋভু।

আবার বলে–তোর কাছে আমি যেতে পারি না ভাই!

বলতে-বলতে অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠে ঋতির দু'চোখ। মনে পড়ে ঊনত্রিশে জানুয়ারির রাতটা। তখনও ঋভু সিকিউরিটি জোনে যায়নি–স্ক্রিনে বারবার দেখাচ্ছে কাতার এয়ারের স্টেটসগামী বিমানের শিডিউল। বাবাকে প্রথমে অনেকক্ষণ জড়িয়ে ধরেছিলো, এরপর মাকে। ক্রমশ দীর্ঘ হচ্ছে জড়িয়ে থাকার সময়। বাবা-মাকে পা-ছুঁয়ে এবার দিদির কাছে–একবার সামনে থেকে, এরপর পিছন থেকে জড়িয়ে ধরে দিদিকে; যেন ছাড়তেই চাইছে না একজন আরেকজনকে। তখন ঋভু-ঋতি দু'জনই অশ্রুপ্লুত। দেবেন মিত্র ও সুলেখা মিত্রও অস্ফুটবাক, নিরন্তর অশ্রুবর্ষণ হচ্ছে। ভাই-বোন এবার কপোলে কপোল লাগিয়ে অনেকণ দাঁড়িয়ে থাকে–তখন চারচোখেই কেবল পানি আর পানি। আজ এই মধ্যরাতে সে-কথা বারবার মনে আসছে ঋতির। একবার মনে মনে বলছে–তুই কী অন্তর্যামী ছিলি ঋভু! বুঝতে পেরেছিলি নাকি আর ফেরা হবে না? প্রথমবার যাওয়ার সময়তো এতটা কাঁদিস নাই ভাই!

আড়াইটারও কিছু পর আবার রুমে ফিরে আসে ঋতি। সময়টা পরেরদিন অঞ্জলি গোমেজই জানিয়েছে।

– আমি টয়লেটে যাব বলে বেরিয়েছি। দেখি ছাদের দিক থেকে আপু আসছেন। আপুকে দেখে দাঁড়ালাম। আপু আমাকে দেখে মুচকি হাসলেন, বললেন, খুব পড়তে হচ্ছে, না। অসাধারণ সে-হাসি কিন্তু শব্দহীন, আমি আজ অবধি অমন সুন্দর করে হাসতে দেখিনি কাউকে। তখন আমি ঘড়ির দিকে তাকালাম। আমি রুম পর্যন্তই যেতে চাইছিলাম। আপু আমাকে ইশারায় না করেছিলেন–আমি কিছুই বুঝতে পারিনি। বলেই হাউমাউ করে কাঁদছে সেকেন্ড ইয়ারের অঞ্জলি গোমেজ।

নিজের রুমে ফেরার সময়ে নীহারের রুমে উঁকি দেয় ঋতি। দরজার আধেকটা খোলা। পড়তে-পড়তে টেবিলেই মাথা রেখে শুয়ে পড়েছে নীহার। ঋতিকে বলেছিলো–শোবার সময়ে আমাকে ডাকিস কিন্তু, অবশ্যই ডাকিস। তখনও কয়েকটা রুমে বাতি জ্বলছে–দক্ষিণদিক থেকে আসতে-আসতে তেমনিই মনে হলো। অনেকেই হয়তো কালকে দিনটা পরীক্ষার পড়ার কাজে লাগাবে, তারা ঘুমিয়ে পড়েছে। নিচতলায় ডাইনিং-এর সঙ্গেই টিভিরুম।